ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

জন্ম ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৮২০ - মৃত্যু ২৯শে জুলাই ১৮৯১

''বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড় জিনিসকে ছোট করিয়া দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা খুব বড় বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত ঐ একখানি যন্ত্র সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা অতি ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন; এবং এই যে বাঙ্গালীত্ব লইয়া আমরা অহোরাত্র আস্ফালন করিয়া থাকি তাহাও অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ন কলেবর ধারণ করে।''

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

''যিনি দরিদ্র ছিলেন তিনি দেশের প্রধান দাতা হইলেন; যিনি লোকাচাররক্ষক ব্রাহ্মণপন্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি লোকাচারের সুদৃঢ় বন্ধন হইতে সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য সুকঠোর সংগ্রাম করিলেন; এবং সংস্কৃত বিদ্যায় যাঁহার অধিকারের ইয়ত্তা ছিল না তিনিই ইংরাজিবিদ্যাকে প্রকৃত প্রস্তাবে স্বদেশের ক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিয়া রোপন করিয়া গেলেন।''

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিদ্যাসাগরের জীবনকাহিনীর অসংখ্য টুকরো কিংবদন্তীর মত বাঙ্গালী সমাজে ছড়িয়ে আছে। তাঁর সাহস, জেদ, মেধা, মাতৃভক্তি, দান, দয়া, স্বাজাত্যবোধ, আত্মাভিমান, বন্ধুবাৎসল্য, রঙ্গরসিকতা, মিতব্যয়িতা, নাস্তিকতা, শিষ্টাচার সব নিয়ে কত না গল্প প্রচলিত। তুলনায় কম প্রচলিত তাঁর শেষ জীবনের কাহিনী, কারণ তা হল বাঙ্গালী জাতির চিরকালের লজ্জা। সারা জীবনের নিরন্তর যুদ্ধে যখন তিনি ক্লিষ্ট ও নিঃস্ব তখনও দেশবাসী ও স্বজনবান্ধবের প্রতারণায় ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন কার্মাটাড়ে অজ্ঞাতবাসে। এই অদ্ভুতকর্মা আত্মাভিমানী পুরুষের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল তাঁর চারিত্র্যশক্তি। তাঁর যাবতীয় কর্মের মধ্যে এই চারিত্র্যের ইতিহাস লিখিত আছে।

তাঁর কার্যাবলীকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় - (ক) শিক্ষা বিস্তার, (খ) সমাজসংস্কার, (গ) সাহিত্যরচনা।

(ক) শিক্ষাচিন্তা ও শিক্ষাবিস্তার -

আধুনিক শিক্ষা কেমন হওয়া উচিত এ নিয়ে বিদ্যাসাগর কবে থেকে চিন্তাভাবনা শুরু করেছিলেন জানা যায় না। সম্ভবত: বালকবয়সে পায়ে হেঁটে বীরসিংহ থেকে কলকাতায় আসার পরে পিতা ঠাকুরদাস তাঁর ভবিষ্যৎ লেখাপড়া নিয়ে যেভাবে চিন্তা করেছিলেন তার মধ্যেই নিহিত ছিল তাঁর শিক্ষাদর্শের বীজ। বাবা চেয়েছিলেন ছেলে সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপন্ডিত হোক। দারিদ্র্যবশত: যে পড়াশোনা তিনি নিজে করতে পারেন নি ছেলে সেটাই করুক এবং পূর্বপুরুষের চতুষ্পাঠী আবার খুলে অধ্যাপনা করুক। ছেলে কৃতবিদ্য হয়ে অর্থোপার্জন করে তাঁর দুঃখ ঘোচাক এ চিন্তা তাঁর একেবারেই ছিল না। আবার কলকাতায় তাঁর হিতৈষীরা বুঝিয়েছিলেন তখন ইংরাজি বিদ্যারই কদর; শুধু সংস্কৃত শিখে জীবিকানির্বাহ করা ক্রমশ: কঠিন হবে। অতএব ঈশ্বর ইংরাজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হোক। শেষ পর্যন্ত একটা মধ্যপথে রফা হয়। ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন যেখানে সংস্কৃত শাস্ত্র সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজি শিক্ষাও দেওয়া হয়ে থাকে।

এইখানে পড়তে পড়তেই সম্ভবত: তাঁর মনে একটি সমন্বিত শিক্ষাদর্শের চেতনা দেখা দেয়, যেখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় সংস্কৃতিরই শ্রেষ্ঠ অংশের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় হবে এবং এক মুক্তবুদ্ধি উদারমনা শিক্ষিতের দল দেশে আসবে।

গৌরবময় ছাত্রজীবন সমাপ্ত করে বিদ্যাসাগর উপাধিধারী ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাইশ বছর বয়সে কাজে ঢুকলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, তারপর সংস্কৃত কলেজ, আবার ফোর্ট উইলিয়ম ও আবার সংস্কৃত কলেজ ঘুরে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে লাভ করলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ। ইতিপূর্বেই তিনি এই কলেজের আমূল পুনর্গঠনের প্রস্তাব পেশ করেছিলেন; কিন্তু তা গৃহীত হয় নি। এখন অধ্যক্ষতার সুবাদে তিনি শিক্ষাদর্শটি রুপায়িত করতে পারলেন (সহজে নয় যদিও, অনেক যুদ্ধের পরে পেরেছিলেন)। সেই আদর্শটি এইরকম -

১। বাঙলাদেশে শিক্ষার তত্ত্বাবধানের ভার যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টি করা।

২। যাঁরা ইয়োরোপীয় আকর থেকে জ্ঞানবিদ্যার উপকরণ আহরণ করতে সক্ষম নন, এবং সেগুলিকে ভাবগম্ভীর, প্রাঞ্জল বাঙলা ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম, তাঁরা এই সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেন না।

৩। যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী নন, তাঁরা সুসংবদ্ধ প্রাঞ্জল বাঙলা ভাষায় রচনা সৃষ্টি করতে পারবেন না। সেইজন্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের ইংরেজী ভাষায় ও সাহিত্যে সুশিক্ষার প্রয়োজন।

৪। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, যাঁরা কেবল ইংরেজী বিদ্যায় পারদর্শী, তাঁরা সুন্দর পরিচ্ছন্ন বাঙলা ভাষায় কিছু প্রকাশ করতে পারেন না। তাঁরা এত বেশী ইংরেজীভাবাপন্ন যে তাঁদের যদি অবসর সময়ে খানিকটা সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলেও তাঁরা শত চেষ্টা করেও পরিমার্জিত দেশীয় বাঙলা ভাষায় কোন ভাবই প্রকাশ করতে পারবেন না।

৫। তাহলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের যদি ইংরেজী সাহিত্য ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলে তারাই একমাত্র সুসমৃদ্ধ বাঙলা সাহিত্যের সুদক্ষ ও শক্তিশালী রচয়িতা হতে পারবে।

৬। পরের প্রশ্ন হল, এই উদ্দেশ্যে সংস্কৃত কলেজে কি ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে?

৭। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ব্যাকরণে ও সাহিত্যে খুব ভালভাবে শিক্ষা দিতে হবে। সাহিত্যের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে কাব্য, নাটক গদ্য সবই থাকবে।

৮। অলঙ্কারশাস্ত্রে তাদের দু-একখানি ভাল বই পড়ালেই চলবে, যেমন 'কাব্যপ্রকাশ'...ও 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থের দু-একটি অধ্যায়।

৯। ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কারশাস্ত্র পাঠ করলে ছাত্রদের সংস্কৃত বিদ্যার ভিত্ দৃঢ় হবে।

১০। স্মৃতিশাস্ত্রে এইগুলি পাঠ্য হতে পারে : মনুস্মৃতি, মিতাক্ষরা —দায়ভাগ, দত্তকমীমাংসা ও দত্তকচন্দ্রিকা। এই শাস্ত্রগুলি পাঠ করলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে ছাত্রদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হবে।

১১। বর্তমানে গণিতশাস্ত্রের পাঠ্য হল লীলাবতী ও বীজগণিত। গণিত-বিজ্ঞানের পক্ষে এই দুখানি বই যথেষ্ট নয়। তা ছাড়া এমন এক পদ্ধতিতে বই দুখানি রচিত, প্রচলিত ছড়া আর্যা ইত্যাদির সাহায্যে, যে আসল বিষয়বস্তু এক-একটি প্রহেলিকা হয়ে উঠেছে। সহজ বিষয় আয়ত্ত করতে প্রায় তিন চার বছর ধরে তাদের বই দুখানি পড়তে হয়। বইয়ের মধ্যে দৃষ্টান্ত না থাকার জন্য অনেক 'সমস্যা' ছাত্রদের বোধগম্য হয় না। আসল কথা হল, সংস্কৃত-গণিত ছাত্রদের পড়ানোর কোন সার্থকতা নেই, কারণ এতে ছাত্রদের প্রচুর সময় ও শ্রমের অপব্যয় হয়। সেই সময়টুকু তারা অন্য প্রয়োজনীয় বিষয় পড়তে পারে।

১২। সেইজন্য সংস্কৃতে গণিত শিক্ষা না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

১৩। এ থেকে একথা বুঝলে ভুল হবে যে আমি শিক্ষার ব্যাপারে গণিতবিদ্যার যথাযথ গুরুত্ব দিই না। তা আদৌ ঠিক নয়। আমি শুধু বলতে চাই যে সংস্কৃতের বদলে ইংরেজীর মাধ্যমে গণিতবিদ্যার শিক্ষা দেওয়া উচিত, কারণ তাতে ছাত্ররা অর্ধেক সময়ে দ্বিগুণ শিখতে পারবে।

১৪। হিন্দু-দর্শনের ছয়টি উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায় আছে, —ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পতঞ্জল, বেদান্ত ও মীমাংসা। ন্যায়দর্শনে প্রধানত তর্কবিদ্যা, অধ্যাত্মবিদ্যা, এবং মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ রসায়ন, আলোকবিদ্যা ও বলবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা আছে। পতঞ্জল ও মীমাংসা সম্বন্ধেও প্রায় ঐ একই কথা বলা যায়। মীমাংসায় উৎসব-পার্বণের এবং পতঞ্জলে ঈশ্বরচিন্তা হল বিষয়বস্তু।

১৫। কলেজপাঠ্য হিসেবে এইসব বিষয় প্রয়োজনীয় কিনা, সে সম্বন্ধে ১৬ ডিসেম্বর ১৮৫০ আমি আমার রিপোর্টে যে মত ব্যক্ত করেছি আজও তাই সমর্থন করি।

১৬। ''এ কথা ঠিক যে হিন্দু -দর্শনের অনেক মতামত আধুনিক যুগের প্রগতিশীল ভাবধারার সঙ্গে খাপ খায় না, কিন্তু তা হলেও প্রত্যেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের এই দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা উচিত। ছাত্ররা যখন দর্শনশ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবে, তার আগে ইংরেজী ভাষায় তারা যে জ্ঞান অর্জন করবে তাতে ইয়োরোপের আধুনিক দর্শনবিদ্যা পাঠ করারও সুবিধা হবে তাদের। ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য দুই দর্শনেই সম্যক জ্ঞান থাকলে, এদেশের পণ্ডিতদের পক্ষে আমাদের দর্শনের ভ্রান্তি ও অসারতা কোথায় তো বোঝা সহজ হবে। সমস্ত রকম মতামতের দর্শন ছাত্রদের পড়তে বলার উদ্দেশ্য হল, সেগুলি পড়লে তারা দেখতে পাবে কিভাবে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের মত খণ্ডন করেছেন এবং এক দর্শনের পণ্ডিত ভিন্ন দর্শনের ভুলভ্রান্তি দেখিয়েছেন এবং প্রতিপাদ্যের যৌক্তিকতা খণ্ডন করেছেন। সুতরাং আমার ধারণা, সর্বমতের দর্শন পাঠ করবার সুযোগ দিলে ছাত্রদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত গড়ে উঠবে।তার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে, দুই দর্শনের মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য কোথায় তাও তারা বুঝতে পারবে।''

১৭। এই শিক্ষার আর - একটি সুবিধা হল এই যে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ভাবধারা আমাদের বাঙলা ভাষায় প্রকাশ করতে হলে যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (technical word) জানা দরকার, তা পণ্ডিতদের আয়ত্তে থাকবে।

১৮। এ-সব বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য থাকার প্রয়োজন নেই। ছাত্ররা যদি এই - গুলি পড়ে তাহলেই যথেষ্ট হবে : ন্যায়দর্শন - গোতমসূত্র ও কুসুমাঞ্জলি; বৈশেষিক-দর্শন —কণাদের সূত্র; সাংখ্যদর্শন—কপিলের সূত্র এবং কৌমুদী; পতঞ্জল দর্শন— পতঞ্জলের সূত্র; বেদান্তদর্শন— বেদান্তসার এবং ব্যাসের সূত্র, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ; মীমাংসাদর্শন— জৈমিনির সূত্র। এগুলি ছাড়া ছাত্ররা 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' পড়বে, কারণ তার মধ্যে সব দর্শনের সারকথা পাওয়া যাবে।

১৯। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ব্যাকরণ ও সাহিত্যশ্রেণীতে পড়বার সময় তিন-ভাগের দুইভাগ সময় সংস্কৃতের জন্য ও একভাগ সময় ইংরেজীর জন্য দেওয়া উচিত। অলংকার, স্মৃতি ও দর্শনশ্রেণীতে পড়ার সময় তাদের প্রধান মনোযোগের বিষয় হবে ইংরেজী। অর্থাৎ তিনভাগের দুভাগ সময় ইংরেজী বিদ্যার জন্য নিয়োগ করা উচিত।

২০। আমার ধারণা, যে সমস্ত বিষয় সংস্কারের কথা আমি এখানে বলেছি, সেগুলি কার্যকর না হলে সংস্কৃত কলেজের কোন প্রকৃত উন্নতি হবার সম্ভাবনা নেই এবং তার আসল আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করাও অসম্ভব।

(স্বাক্ষর) ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা
১২ই এপ্রিল ১৮৫২

(মূল ইংরাজি প্রস্তাব থেকে বিনয় ঘোষের অনুবাদ)

১৯৪৬ থেকে ১৮৬৫ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের মধ্যাহ্নকাল। মধ্যে কিছুদিনের জন্য তিনি স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টরের পদেও ছিলেন। বাঙ্গলা দেশে স্কুল শিক্ষার - শোচনীয় অবস্থা স্বচক্ষে দেখে তার প্রতিকারও করেছিলেন। তার মধ্যে পড়ে ২০ টি মডেল স্কুল স্থাপন, শিক্ষক শিক্ষন বিদ্যালয় স্থাপন, ৩৫ টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন, অসংখ্য বেসরকারি বিদ্যালয় স্থাপনে সহায়তা, মেট্রোপলিটান স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা। নিজের অর্থ শ্রম ও কল্পনাশক্তি অকাতরে ব্যয় করেছেন এ সব কাজের পিছনে। এদের জন্য পাঠ্যতালিকা এবং পাঠ্যপুস্তকও রচনা করেছেন।

(খ) সমাজসংস্কার-

সমাজসংস্কারই ছিল বিদ্যাসাগরের আসল কাজ। উনবিংশ শতাব্দীর সেই সূচনালগ্নে রেনেসাঁসের সূচনাপর্বে আমাদের সমাজ যে কতদূর সংস্কারাচ্ছন্ন ছিল, এবং সমাজপতিদের দাপট যে কত বেশি ছিল আজ আমরা তা কল্পনাও করতে পারব না। সেই কালেই বিদ্যাসাগর তাঁর কর্মজীবনের সূচনা থেকেই অনেকগুলি সাহসের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সংস্কৃত কলেজে ঢুকে প্রথমে ক্ষমতা পাওয়া মাত্র তিনি যা করেছিলেন তা হল সব শ্রেণীর ছাত্রকে পড়বার অধিকার দেওয়া। তাঁর আগে এখানে অব্রাহ্মণ ছাত্রদের প্রবেশাধিকার ছিল না। তিনি সেই নিয়ম উঠিয়ে ছিলেন।

তারপর হাত দিলেন বৃহত্তর কাজে। তিনি বুঝেছিলেন প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা বলীয়ান হলে আমাদের দেশের পুরষ তার পথ খুঁজে নেবে। কিন্তু নারীদের জন্য সে পথ খোলা ছিল না। একে তারা অশিক্ষায় ও নির্যাতনে অন্তঃপুরে রুদ্ধ। তার ওপর কৌলীন্যপ্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি এই নিরুপায় নারীদের দুঃখ বাড়িয়েই চলেছে। তাঁর আগে অনেক যুদ্ধ করে রামমোহন সতীদাহ প্রথা বন্ধ করে মেয়েদের কিছুটা স্বস্তি দিয়েছিলেন। এখন বিদ্যাসাগর চাইলেন তাদের নিরাপত্তা। দুভাবে এই নিরাপত্তা পাওয়া যেতে পারে, এক স্ত্রীশিক্ষা, দুই বিধবার পুনর্বিবাহ। বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধতা করেছিলেন শুধু রক্ষণশীলেরাই নয়, অনেক আধুনিকপন্থী বিদ্বান ব্যক্তিও। বিদ্যাসাগর শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করে প্রমাণ করেছিলেন এ কাজ শাস্ত্রসম্মত; নানবিধ পুস্তিকা প্রণয়ন করে জনমত গঠন করেছিলেন; আর অসংখ্য বিধবা বালিকাকে নিজ উদ্যোগে ও ব্যয়ে বিয়ে দিয়ে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। নিজের একমাত্র ছেলে নারায়নের সঙ্গেও বিবাহ দিয়েছিলেন বিধবা কন্যার। দেশকালের বিরুদ্ধতা তো ছার, নিজের পরিবারের অভ্যন্তরীন শত্রুতাতেও তিনি পিছপা হন নি। এ বিষয়ে একটি প্রাসঙ্গিক পত্রাংশ স্মরণ করা যেতে পারে। -

''বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এ জন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনো সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি, এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্তস্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি। আমি দেশাচারের দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহা করিব, লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।''(১৮৭০ খৃঃ অব্দে লেখা একটি চিঠির অংশ)

বহুবিবাহ নিরোধের জন্যও তিনি অনেক প্রচার করেছিলেন। যদিও তাঁর জীবদ্দশায় এ বিষয়ে কোনো আইন হয় নি (স্বাধীনতার পরে হয়) । তবে জনমত গঠিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। শিক্ষিত সমাজে বহুবিবাহ আপনিই কমে আসে।

(গ) সাহিত্য সৃষ্টি -

ফোর্ট ইউলিয়ম কলেজের পণ্ডিতবর্গের হাতে বাংলা গদ্যভাষার সূচনা হয় উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে সূত্রপাতের কালে। পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনে উদ্ভাবিত সেই গদ্যের কোনো আদর্শ ছিল না। হয় সংস্কৃত, নয় ফার্সী শব্দে ও অন্বয়ে সেই ভাষা আড়ষ্ট ছিল। ১৮১৫ নাগাদ রামমোহন যখন সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থগুলি একটি একটি করে অনুবাদ করতে শুরু করলেন তখন গদ্য ভাষা বিষয়গৌরব লাভ করল বটে, কিন্তু কোনোরকমে কাজ চালানো ছাড়া তার অন্য কোনো উদ্দেশ্য পাওয়া যেত না। এই পরিস্থিতিতে বিদ্যাসাগর কলম ধরলেন।

প্রথমেই বলা ভালো যে সাহিত্যরচনার কোনো নান্দনিক উদ্দেশ্য বিদ্যাসাগরের ছিল না। তাঁর লক্ষ্য ছিল শিক্ষা ও সমাজ। সাহিত্যরচনা সেই উদ্দেশ্যেরই উপজাত ফল (Biproduct), কিন্তু মহৎ প্রতিভা যা স্পর্শ করে তাকেই উদ্ভাসিত করে তোলে। তাই পাঠ্যপুস্তক বা প্রচারপত্র যেটাই তিনি লিখুন না কেন তাতেই সাহিত্যগুণের ছোঁয়া লাগল; এবং কার্যত: তাঁর হাতেই শিল্পগুণ সমৃদ্ধ - প্রাঞ্জল বাংলা গদ্যের সূত্রপাত হল। প্রসঙ্গত : উল্লেখ্য যে বাংলা গদ্যে কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি চিহ্নের প্রবর্তনও তিনিই করেন। তাঁর রচনাবলীতে বর্ণপরিচয় ও উপক্রমণিকা নামক যে দুটি অমর পাঠ্যপুস্তক আছে, শুধু সেই দুটির জন্যই তিনি বাঙ্গালীর অন্তরে তিনি চিরকাল জীবিত থাকবেন; যদি আর কিছু না করতেন তা হলেও।

তাঁর অন্যান্য প্রধান রচনা-

১। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ - শকুন্তলা, সীতার বনবাস, (কালিদাস, ভবভূতি)

২। হিন্দি থেকে অনুবাদ - বেতাল পঞ্চবিংশতি, (বেতাল পচ্চিশি)

৩। ইংরাজি থেকে অনুবাদ
ভ্রান্তিবিলাস- Comedy of Errors : Shakespeare
বাঙ্গলার ইতিহাস - History of Bengal : Marshman
জীবনচরিত- Biographies : Chambers
বোধোদয় - Rudiments of Knowledge
কথামালা - Aesop's Fables

৪। মৌলিক রচনা -
(ক) বিতর্ক - বিধবাবিবাহ চলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব;
বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার;
(খ) প্রভাবতী সম্ভাষণ (শোকস্মৃতি)
(গ) স্বরচিত জীবনবৃত্তান্ত (আংশিক জীবনী)
(ঘ) অতি অল্প হইল; আবার অতি অল্প হইল। (ব্যঙ্গাত্মক রচনা)

শান্তিসুধা মুখোপাধ্যায়